সমসাময়িক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়েছে। অবশ্য এ শতাব্দীতেও কিছু কিছু নতুন কাব্যশাখার উদ্বোধন হয়েছিল যাতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এখানে সেই ধরনের নতুন কবিকর্মের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে : এই উপচ্ছেদে আমরা ১. শাক্ত পদাবলী, ২. বাউল গান এবং ৩. গাথা ও গীতিকা সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১. শাক্ত পদাবলী

সূচনা ।। অষ্টাদশ শতাব্দীর যদি কোনো উল্লেখযোগ্য কাব্যবৈচিত্র্য থাকে তবে তা হল শাক্ত পদাবলী। শক্তি অর্থাৎ উমা-পার্বতী-দুর্গা-কালিকাকে কেন্দ্র করে যে গান রচিত হয় তাকে বলা হয় শাক্তগান। অবশ্য সেকালে এই গানকে বলা হত 'মালসী'। বোধ হয় মালবশ্রী রাগে এই গান গাওয়া হত বলে এর এই বিচিত্র নামকরণ। এখন এ নাম প্রায় অপরিচিত হয়ে গেছে। অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীই শাক্ত পদাবলীর উৎসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, প্রভাবিত করেছে। উপরন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর পিছনে রয়েছে চারশো বছরের ঐতিহ্য, আর শাক্ত পদাবলীর উৎপত্তি ও বিকাশ এক শতাব্দীর মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। অবশ্য শাক্ত ভাব ও ভাবনা শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যাপার নয়, বহুকাল থেকে বাঙালির শিরায় শিরায় শাক্ত ভাবধারা প্রচ্ছন্নভাবে বয়ে এসেছে। প্রাচীনকাল থেকে এ-দেশ তন্ত্রপ্রধান মাতৃকাপূজার পীঠস্থান, উপরন্তু প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে পৌরাণিক যুগের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগ পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষেই আদ্যাশক্তির কোনো-না-কোনো প্রকার পূজা উপাসনা চলে এসেছে।

সমগ্র বিশ্ববিধানের অন্তরালে একটি সর্বশক্তিময়ী মাতৃকাবোধের প্রভাব অতি প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার স্বীকৃতি লাভ করে আসছে। আমাদের ঋগ্‌বেদের সূক্তেও এই আদ্যাশক্তির উল্লেখ আছে। পরবর্তিকালে ইনিই চণ্ডিকা নাম নিয়ে পার্বতীর সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে এই দেবীর আখ্যান নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। আদিতে তাঁর সঙ্গে মহাদেবের কোনো যোগ ছিল না, অসুর বধের জন্য দেবতারাই দেবীকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং নানা আয়ুধে সাজিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, পরে তিনি উমা-পার্বতীর সঙ্গে এক হয়ে যান।

বাংলাদেশে একই সঙ্গে পৌরাণিক ও লৌকিক চণ্ডীর আখ্যান প্রচলিত ছিল, অবশ্য লৌকিক চণ্ডীকে কেন্দ্র করেই চণ্ডীমঙ্গল-অভয়ামঙ্গল রচিত হয়—যেগুলি মধ্যযুগে অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিল। সংস্কৃত পুরাণ অবলম্বন করে দুর্গামঙ্গল, মৃগলুব্ধ, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি সংস্কৃতঘেঁষা কাব্য রচিত হয়েছিল—তার মধ্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সুপ্রসিদ্ধ, মঙ্গলকাব্যের শাক্ত দেবীদের (বিশেষত মনসা ও চণ্ডী) যে বর্ণনা আছে তাতে ভক্তি ও বাৎসল্য বেশি প্রকাশিত হতে পারেনি, মনসার মধ্যে তো কিছুমাত্র মানবিক গুণ (অর্থাৎ মাতৃভাব) নেই, বরং চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ স্নেহবাৎসল্যের প্রকাশ দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যের ভক্তেরা দেবীর কাছে ধনজন-ঐশ্বর্য প্রার্থনা করেছেন, নিরাপত্তার বর চেয়েছেন। তাঁর কৃপায় ব্যাধও রাজা বনে যায়। আবার যার ওপর তাঁর ক্রোধ সঞ্চারিত হয়, বিনা কারণে তিনি তার সর্বনাশ করে ছাড়েন। ভক্ত তাঁর কাছ থেকে আশাতীত ধনৈশ্বর্য পায়, কিন্তু যে তাঁকে অসম্মান করে, পূজা প্রচারে বাধা দেয়, তাকে তিনি ধনেপ্রাণে নষ্ট করেন। মঙ্গলকাব্যে ভক্তেরা স্বার্থের বশে অনেক সময় দেবীকে ভক্তি করে, দেবীও নিজ স্বার্থের খাতিরেই ভক্তদের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য হন। সে স্বার্থ হল সমাজে ভক্তদের দ্বারা দেবীর মহিমা ও পূজা প্রচার। সুতরাং মঙ্গলকাব্যে, বিশেষত শাক্ত মঙ্গলকাব্যে বল, প্রতাপ, অনাচার-অত্যাচারই প্রবল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শাক্ত সাহিত্যের এক অভিনব রূপান্তর হয়। বাংলাদেশে সর্বশক্তিময়ী আদ্যাশক্তিকে দুর্গারূপে ভক্তি-বাৎসল্যের দৃষ্টিতে দেখে একপ্রকার অতি চমৎকার পদসাহিত্যের সৃষ্টি হয়। একে 'শাক্ত পদ' বলা হয়ে থাকে। অবশ্য শাক্ত-পদের উমা-পার্বতী-দুর্গা পুরাণ থেকেই সংগৃহীত, এই শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গলের কাহিনী বা তত্ত্বের দিক থেকে কোনো সম্পর্ক নেই। তন্ত্রের দেশ বাংলায় শাক্ত পদের সঙ্গে তন্ত্র-সাধনারও গূঢ় যোগাযোগ আছে। অনেক পদকর্তাই তন্ত্রানুমোদিত কালীসাধক ছিলেন।

বাংলাদেশের শাক্ত পদে প্রকাশিত বাৎসল্যরস ও স্নেহভক্তির একনিষ্ঠ আবেগ যে গীতিশাখার সৃষ্টি করে, তা একাধারে গীতি, রোমান্টিক কবিতা ও সাধনায়ুধ। কবিগণ তাই যুগপৎ সাধক ও কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শাক্ত-পদের কিছু কিছু উল্লেখ থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অনেক ভক্ত শাক্ত পদ লিখেছিলেন। এঁদের কেউ ভক্তগৃহী, কেউ ত্যাগী, কেউ-বা রাজা-মহারাজা-মন্ত্রী-দেওয়ান। কিন্তু তাঁদের সামাজিক অবস্থার মধ্যে ব্যবধান থাকলেও ভক্তির দিক থেকে তাঁরা সকলেই শ্যামা মায়ের কোলের ছেলে। ষড়ৈশ্বর্যময়ী আদ্যাশক্তিকে তাঁরা মা বলে তাঁর অঞ্চল আশ্রয় করেছেন ; মহাকালিকার কোলে উঠে মহাকালকে তুচ্ছ করেছেন, লেলিহজিহ্বা, দিগ্‌বসনাত্মিকা আদ্যাশক্তির উদ্যত খড়্গের সামনে নিজেদের সঁপে দিয়ে তাঁরা মৃত্যুভয় জয় করেছেন, সংসারে সংসারী থেকেও ভক্তেরা 'ভবদারা'র প্রসাদ পেয়েছেন। স্নেহমিশ্রিত এই যে বাৎসল্যরস—এর মাধুর্য বড়োই স্বাদু। এর সঙ্গে মিশিয়ে আছে মানুষের শৈশব-সংস্কার। অসহায় শিশু একমাত্র মা ছাড়া আর কাউকে জানে না, ভয় পেলে মায়ের কোলেই কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে, কখনও কখনও পাষাণী মাকে সে খুব কটু কথা শুনিয়ে দেয়, অভিমান করে মায়ের ডাকে সাড়া দেয় না। তেমনি এই সমস্ত সাধকের দলও শৈশবজীবনের অসহায় বালকের বেশে শ্যামাজননীকে আশ্রয় করেছেন, আবার কখনও স্ফুরিতাধরে মায়ের দিক থেকে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে তাঁদের সেই মায়ের অঞ্চলেই আশ্রয় নিতে হয়েছে।

শাক্ত পদাবলীর মধ্যে কিছু গান উমার বাল্যলীলা এবং হরপার্বতীর কাহিনী নিয়ে রচিত। এর শ্রেষ্ঠ অংশের নাম 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গান। এই আগমনী ও বিজয়া বাঙালির প্রাণের সামগ্রী। দুর্গাপূজা উপলক্ষ করে এই সমস্ত গান রচিত হয়েছিল, এখনও তার কিছু কিছু শারদীয়া পূজাতে পথ-ভিখারির কণ্ঠে শোনা যায়। এই গানে বাঙালি মায়ের প্রবাসিনী কন্যার জন্য আকুল কামনা ব্যক্ত হয়েছে। কন্যা উমা বৎসর পরে আবার হিমালয় গৃহে আসবেন, মায়ে-ঝিয়ে মিলন হবে, মেনকার এই আকাঙ্ক্ষাটি আগমনী গানে ব্যক্ত হয়েছে। উমা পিত্রালয়ে আসার পর তিনদিন ধরে আনন্দের হাট বসে গেল, কিন্তু নবমীর নিশি অতিক্রান্ত হতে না হতেই ভোলামহেশ্বর শ্বশুর-ভবনে উপনীত হয়ে গণেশজননীকে আহ্বান করলেন। মা মেনকাকে চোখের জলে আবার এক বছরের জন্য উমাকে ছেড়ে দিতে হল। এই বেদনাদায়ক স্মৃতি অবলম্বনে বিজয়ার করুণরসের গানগুলি লেখা হয়েছে। এই গানের মধ্যে দেবীকে মানবী মাতার কন্যারূপে উপস্থিত করা হয়েছে, আগমনী-বিজয়াতে বাস্তব মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল বেদনা চমৎকার ফুটেছে। শাক্তপদকারগণ মাটির মাকে সামনে রেখে এ গানগুলি লিখেছিলেন, তৎকালীন বাংলাদেশের মায়েদের বেদনার কথাই এতে ফুটে উঠেছে। তাই বৈষ্ণব পদের চেয়ে শাক্ত পদ মানবরসের বিচারে স্বাদুতর হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলী ভাববৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণের সূক্ষ্মরসোত্তীর্ণ প্রেমগীতিকা, আর শাক্ত পদাবলী বাস্তব বাংলাদেশের বাস্তব মায়ের বেদনার গান। একটি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এসেছে, আর একটি মর্ত্য থেকে স্বর্গের

দিকে হাত বাড়িয়েছে। একটির (বৈষ্ণব) মূল রস আদিরস—তাই-ই ভক্তিতে পরিণত হয়েছে, আর একটির (অর্থাৎ শাক্ত পদ) মূল রস বাৎসল্য রস—তাও ভক্তিতে পরিণত হয়েছে। বৈষ্ণব-পদাবলীতে বহু প্রথম শ্রেণীর পদকর্তার আবির্ভাব হয়েছিল, তাই অসংখ্য বৈষ্ণব পদে অতি উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ পাওয়া যায়, ভাষা-ছন্দ-ভাব-অলংকার-ব্যঞ্জনা প্রথম শ্রেণীকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে ঠিক ঐ পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর কবির আবির্ভাব হয়নি। পদগুলির গানের সুর বাদ দিলে এর শিল্প লক্ষণ অনেক সময় নিতান্তই সাধারণ স্তরের। বৈষ্ণব পদাবলীর সাধনভজনের অতিরিক্ত একটি সুষম সৌন্দর্যবোধ আছে, যা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকেও সৌন্দর্যরসে মুগ্ধ করবে ; কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে গীতিরসের অতিরিক্ত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ-জাত কাব্যলক্ষণ অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণীয়। বৈষ্ণব পদাবলী আদিরসকে ভিত্তি করেছিল বলে কালক্রমে অনধিকারীর হাতে পড়ে সে 'উজ্জ্বলরস' অমেধ্য কটু পানীয়ে পরিণত হয়েছিল, শৃঙ্গার রসের নালা বেয়ে অতি সহজেই কামপুষ্প ভেসে এসেছিল। ফলে শুদ্ধ বৈষ্ণব পদসাহিত্য বিকৃত হয়ে পড়েছিল। যথা—বৈষ্ণব সহজিয়াদের গান ও গূঢ়পদ্ধতির সাধনভজন। কিন্তু শাক্ত পদাবলীর মূল রস বাৎসল্যভাব, মা ও সন্তানের সম্পর্ক। এর তো কোনো বিকার নেই, মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে নিত্যকালের সম্পর্ক। তাই শাক্ত পদাবলীর মধ্যে উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ না থাকলেও শেষ দিকের বৈষ্ণব পদাবলীর মতো শাক্ত পদসাহিত্য ও শাক্ত ভক্তের মধ্যে কোনও প্রকার অশুচিতা প্রবেশ করে মা-সন্তানের স্নেহ-ভক্তিকে কলুষিত করেনি। অবশ্য শাক্তপদকারেরা অনেক সময় বৈষ্ণব পদের দ্বারা, বিশেষত বৈষ্ণব পদসন্নিবেশের রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতো শ্রেণীগত পৃথক মনোভাব ছিল না। ঔদার্যের বশে শাক্তকবিরা কালী ও কৃষ্ণকে অভেদ কল্পনা করেছেন। গোষ্ঠলীলার আদর্শে রামপ্রসাদ উমার গোচারণের পদ লিখেছিলেন। বৈষ্ণবগণ এ ধরনের ঔদার্যের বিশেষ পরিচয় দিতে পারেননি, তাঁরা শাক্ত সম্প্রদায় ও শাক্ত আচার-আচরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

তন্ত্রের সঙ্গে শাক্ত পদ ও পদকারের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা আগেই বলা হয়েছে। তন্ত্র আদ্যাশক্তির উপাসনা করে এবং বিশেষ বিশেষ কৃত্যের সাহায্যে স্বদেহেই মোক্ষনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করে। শাক্ত কবিদের অধিকাংশই তান্ত্রিক ছিলেন এবং তন্ত্রের কৃত্যগুলিকে নানা রূপকে, উপমায়, ব্যঞ্জনায়, গানে ব্যবহার করেছেন। কেউ কেউ নিছক সাধনভজনের তত্ত্বকথাকে রূপক প্রতীকের ছদ্মবেশে বর্ণনা করেছেন। এগুলির মধ্যে যে গানে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ফুটেছে সেগুলি শুধু কবিতা বা গান পদবাচ্য হয়েছে—আর যাতে কেবল তত্ত্ব ও সাধনার কথা প্রাধান্য পেয়েছে, তাকে আমরা আর যাই বলি না কেন, পদ বা কবিতা বলতে পারব না। বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্গে শাক্ত পদের আর একটা বড়ো তফাত, শাক্ত-পদকারেরা স্থূল বাস্তবজীবন থেকে অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ফলে, অধ্যাত্মকথাও অনেক স্থলে বাস্তব সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র রসরূপ লাভ করেছে। কোনো কোনো পদকর্তা ছিলেন হৃতসর্বস্ব জমিদার বা দেওয়ান, কেউ ছিলেন রাজকুমার। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে এঁদের অনেকেই ইংরেজ রাজত্বের কুশাসনের ফলে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হন। সেইজন্য তাঁদের অনেক পদে ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্ভাবনা বড়ো রকমের ছায়াপাত করেছে—এ পদগুলির পশ্চাতে একটা দেশ ও কালের ছবি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার বাতাবরণ বিশুদ্ধ রোমান্টিক ও নিঃশ্রেয়স্ ভক্তিকেই অবলম্বন করেছে বলে তা থেকে সমসাময়িক দেশ ও

কাল এবং পদকর্তাদের জীবনে তার প্রভাব বিশেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এবার আমরা কয়েকজন প্রসিদ্ধ শাক্তপদকর্তা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

রামপ্রসাদ সেন।। ইতিপূর্বে আমরা বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের কথা বলেছি। রামপ্রসাদের ঈষৎ পূর্বে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি শাক্ত গীতিকার না হলেও শাক্তমতের কবি ছিলেন এবং দেবী অন্নদার প্রতি তাঁর মনোভাব শাক্ত কবিদের মতোই একনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু শাক্ত পদাবলীকে কবিত্বের উচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরে তাতে একপ্রকার সুগভীর সুর সংযোজনা করে এবং কবিত্বের সঙ্গে সাধনার ধারা সংযোজিত করে সাধককবি রামপ্রসাদ সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের কৃত্রিম কক্ষে মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করেছিলেন।

'কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরে' রামপ্রসাদ যৎসামান্য আত্মপরিচয় দিয়েছেন। পরে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রামপ্রসাদের ভক্ত কবি ঈশ্বর গুপ্ত নিজে চেষ্টা করে রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্ধার করেন। এ পর্যন্ত যাঁরাই রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তাঁরাই ঈশ্বর গুপ্তের তথ্য ব্যবহার করেছেন। বৈদ্যবংশোদ্ভূত রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ খুব প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত তথ্যানুসারে মনে হয়, আনুমানিক ১৭২০-২১ খ্রীস্টাব্দে রামপ্রসাদ হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। রামপ্রসাদ পিতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। রামপ্রসাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা—রামদুলাল, রামমোহন, পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। কবি কলকাতার কোনো ধন্যাঢ্য জমিদারের বাড়িতে মুহুরিগিরি করতেন। এই সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, কবি জমিদারি সেরেস্তার খাতায় 'আমায় দাও মা তবিলদারী' গানটি লিখে উপরিতন কর্মচারীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন, কিন্তু সহৃদয় জমিদার কবিকে কর্ম থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিশ্চিন্তে সাধনভজন করবার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। গুণগ্রাহী কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্র এবং আরও কয়েকজন ভূস্বামী নির্লোভ কবিকে জমিজমা ও বৃত্তি দিয়েছিলেন। আপনভোলা কবি অর্থের ব্যাপারে চিরকাল উদাসীন ছিলেন। ফলে তাঁর দারিদ্র্যদশা কোনো দিন ঘোচেনি। তিনি শুধু সাধক ও কবি ছিলেন না, একজন ভালো গায়কও ছিলেন। নিজের গানে তিনি যে সহজ সাদামাঠা সুর দিতেন, তা-ই 'প্রসাদী সুর' নামে প্রচলিত। এখনও সেই প্রাণগলানো সুর পথভিখারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও রামপ্রসাদী গান এখনও পর্যন্ত জনপ্রিয়তা রক্ষা করছে। শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির গান শোনবার জন্যই কবির গ্রামের নিকটে নিজের কাছাড়ী বাড়িতে অবস্থান করতেন। উপযুক্ত বয়সে সাধক-কবি শ্যামাপূজার বিসর্জনের সায়াহ্নে ভাগীরথীনীরে সজ্ঞানে তনুত্যাগ করেন।

এই প্রসঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে দু'-এক কথা বলা যেতে পারে। পূর্ববঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে আর একজন শাক্ত কবি ও সাধক রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনিও অনেক চমৎকার পদ লিখেছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত সে-যুগে পূর্ববঙ্গের মাঝিমল্লাদের পরম ভক্তিভরে দ্বিজ রামপ্রসাদের গান গাইতে শুনেছিলেন। এখন রামপ্রসাদের পদাবলী নামে যে সংগীতসংগ্রহ ছাপা হয়ে থাকে, তাতে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদ স্থান পেয়েছে তা অবিকল রামপ্রসাদ সেনের গানের মতোই। কাজেই শুধু ভাষা দেখে কোন্‌টি রামপ্রসাদ সেনের আর কোন্‌টি দ্বিজ রামপ্রসাদের তা নির্ণয় করা যায় না। অনেক সময় পুঁথির লিপিকার এবং গায়কেরাও দুই কবির ভণিতা গোলমাল করে ফেলেছেন। রামপ্রসাদ চক্রবর্তী বলে আর একজন আধুনিক কালের কবিওয়ালাও অনেক পদ লিখেছিলেন এবং শুধু 'রামপ্রসাদ' ভণিতা ব্যবহার করেছিলেন। ফলে এতে গোলমালের কারণ বেড়েই গেছে। যে সমস্ত পদে আধুনিক ধরনের শব্দবিন্যাস আছে সেগুলি যে কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্তীর রচনা তাতে সন্দেহ নেই।

আজু গোঁসাই নামে এক বৈষ্ণব ভক্ত-কবি রামপ্রসাদের গ্রামেই বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে রামপ্রসাদের বেশ কৌতুকাবহ কবিতার লড়াই হত। একজন ছিলেন বৈষ্ণব, আর একজন শাক্ত ; সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই উভয়ের মধ্যে কিছু ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ বাক্যবিনিময় হত। সেই সমস্ত তীক্ষ্ণ বাক্যবিনিময় গানের আকারে এখনও প্রচলিত আছে।

রামপ্রসাদ কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন নামে দু-খানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখেছিলেন, তার মধ্যে কৃষ্ণকীর্তনের যৎসামান্য পাওয়া গেছে। কিন্তু কালীকীর্তনের পুঁথি দুর্লভ নয়। এতে তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর ছাঁদে উমার বাল্য ও গোষ্ঠ বর্ণনা করেছেন। এ কথা বলতেই হবে যে, কালীকীর্তনে রামপ্রসাদের প্রতিভা প্রকাশের পথ পায়নি। উমা কৃষ্ণের মতো মাঠে গিয়ে গোরু চরাচ্ছেন, বাঁশি বাজিয়ে গোরুকে ডাক দিচ্ছেন—এ বর্ণনা অনেক স্থলেই হাস্যকর। এই বিসদৃশ বর্ণনাকে ব্যঙ্গ করে আজু গোঁসাই নামে তাঁর সেই প্রতিবেশী বলেছিলেন—"কাঁঠালের আমসত্ত্ব"—"না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।" কালীকীর্তনের ওপর রামপ্রসাদের কবিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি—তাঁর যা কিছু খ্যাতি, তা তাঁর শাক্ত গানের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে মুদ্রিত রামপ্রসাদের পদাবলীর সংখ্যা ছিল প্রায় একশো। এখন তা বেড়ে বেড়ে প্রায় তিনশোতে দাঁড়িয়েছে। এই গানগুলির মধ্যে কয়েকটা স্তর লক্ষ্য করা যায় : ১. উমা-বিষয়ক (আগমনী ও বিজয়া), ২. সাধন-বিষয়ক (তন্ত্রোক্ত সাধনা), ৩. দেবীর বিরাট স্বরূপ-বিষয়ক, ৪. তত্ত্বদর্শন ও নীতি-বিষয়ক। এর মধ্যে আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদের সংখ্যাও অল্প, গুণগত উৎকর্ষও অল্প। সাধন-বিষয়ক পদে কবি নানা উপমারূপকের মধ্য দিয়ে নিজের সাধনার কথা আভাসে ব্যক্ত করেছেন। তত্ত্ব ও নীতির বিষয়ে তিনি যে সমস্ত গান লিখেছিলেন, তাতে শুষ্ক নীতি ও নিষ্করুণ বৈরাগ্য ব্যতীত আর কোনো উচ্চতর অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায় না। কিন্তু আদ্যাশক্তির স্বরূপ এবং তাঁর সঙ্গে কবির বাৎসল্যরসের যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। উমার বাল্যলীলাসংক্রান্ত যে-পদটি রামপ্রসাদের ভণিতায় চলে ('গিরিবর, আর পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে'), বৈষ্ণব পদাবলীতেও তার সমকক্ষ বাৎসল্যরসের পদ দুর্লভ।

রামপ্রসাদের বহু পদ প্রবাদবাক্যের মতো সমগ্র দেশের কণ্ঠে ছড়িয়ে আছে। তাঁর সেই প্রসিদ্ধ নির্বেদ-বৈরাগ্যের গান :

> প্রসাদ বলে, থাকো বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা
> যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা॥

কিংবা :

> রইলি না মন আমার বশে।
> ত্যজে কমলদলের অমলমধু মত্ত হলি বিষয়রসে॥

অথবা :

> মন-গরীবের কি দোষ আছে।
> তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা যেমনি নাচাও তেমনি নাচে॥

এগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদবিশেষ। সংসার-জ্বালায় জর্জরিত কবি কখনও কখনও বিষণ্ণ কণ্ঠে গান ধরেছেন :

আমি কি দুখেরে ডরাই।
ভবে দাও মা দুঃখ আর কত চাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোনো খানেতে যাই
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥

পরিশেষে দুঃখের বড়াই করে কবি শান্তি লাভ করেছেন :

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি দুখের বড়াই॥

কবি অনেক আশা করেছিলেন, কিন্তু 'আসার আশা ভবে আসা আসা মাত্র হল।" সমস্ত জীবন বৃথাই কেটে গেল—কবির সেই ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘ নিশ্বাস বড়ো করুণ হয়ে আমাদের অন্তর স্পর্শ করে :

মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেল॥

রামপ্রসাদের নিরাভরণ প্রাণের বাণী এমনি সাদা কথায় ধরা পড়েছে। শ্যামার সঙ্গে তাঁর মা-ছেলের সম্পর্ক, মান-অভিমানের সম্পর্ক—এমনকি কটুকথার সম্পর্ক। আদ্যাশক্তিকে এমনভাবে মর্ত্য-জননী রূপে খুব কম সাধকই আঁকতে পেরেছেন। কবি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন বটে, কিন্তু সেই দুঃখকে স্বীকৃতি দেননি। দেবী কালিকার গান স্মরণ করে তিনি অনায়াসে ভবার্ণব পার হয়ে গেছেন। তাই তাঁর পদ আশাহীন মানুষের বড়ো সান্ত্বনাস্থল, বাস্তব দুঃখের একমাত্র প্রতিষেধক। তত্ত্বসাধনার সঙ্গে বাস্তব জীবন ও সুখদুঃখের এমন নিবিড় সংযোগ অন্য কবির খুব অল্প পদেই পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর মতো রামপ্রসাদের গান বৈকুণ্ঠের গান নয়, তার সঙ্গে ধূলি ও ধরিত্রীর নিবিড় যোগ আছে বলে আধ্যাত্মিকতা বাদ দিয়েও তার কাব্যরস উপলব্ধি করা যায়—যে কাব্যরস বাস্তব-জীবনকে অবধারণ করে আছে। শ্যামার সন্তান রামপ্রসাদ অধ্যাত্মসাধনা, বাস্তবতা ও কাব্যরসের ত্রিবেণী রচনা করে ভক্তির গীতি-সাহিত্যকে নতুন সার্থকতার পথে প্রেরণ করেছেন। মধ্যযুগের অধিকাংশ কবি অধুনা নামমাত্রে পর্যবসিত, তাঁদের কাব্যাদি পড়ুয়া ছাত্র ও গবেষকের অনুশীলনের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রায় দুশো বছর আগে লোকান্তরিত রামপ্রসাদ সেন এখনও প্রবাদবাক্যের মতো বেঁচে আছেন, তাঁর অলৌকিক জীবন সম্বন্ধে কত গালগল্প গড়ে উঠেছে। তাঁর গানগুলি উদার আকাশের মতো বিশাল, সরল সুরের হাওয়ায় মনের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা বিক্ষোভ-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। বাঙালির হৃদয়ে তাঁর আসন চিরদিন অটুট থাকবে।

সাধক কমলাকান্ত।। বাংলার শাক্ত পদসাহিত্যের আর একজন কবি ও সাধক প্রায় রামপ্রসাদের মতোই গৌরব লাভ করেছেন, তাঁরই মতো স্মরণীয় হয়েছেন এবং ভক্তিরস, সংগীতরস ও কবিত্বে তিনি রামপ্রসাদের সমকক্ষতা লাভ করেছেন। তিনি বর্ধমান-নিবাসী সাধক ও কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)। তাঁর অলৌকিক জীবন-কথা রামপ্রসাদের মতোই জনপ্রবাদের আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। কমলাকান্ত প্রথম জীবনে 'সাধক-রঞ্জন' নামে একখানি তন্ত্রসাধনার গ্রন্থ বাংলা কবিতায় রচনা করেছিলেন—তার শেষে কবি যে যৎসামান্য আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বর্ধমান নিবাস কালে তিনি বর্ধমান রাজবাটীর গভীর সংস্পর্শে আসেন, উক্ত রাজারা তাঁকে বিশেষ ভক্তি করতেন। লোকান্তর

প্রাপ্তির পর বর্ধমান রাজবাটী থেকে তাঁর প্রামাণিক পদসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সূত্রে তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু কাহিনীও সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার কালনা গ্রাম। বাল্যবয়সে তিনি সংস্কৃত টোলে পাঠ করে সংস্কৃত বিদ্যা অর্জন করেন। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হলে তিনি বর্ধমানে (খানা জংশনের নিকট) চাম্তা গ্রামে মাতুলালয়ে চলে আসেন এবং এখানে প্রতিপালিত হন। তাঁর চরিত্র ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানরাজেরা তাঁকে বিশেষ ভক্তি করতেন, তাঁকে সভা-পণ্ডিতও করেছিলেন। কোনো কোনো রাজকুমার তাঁকে গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দুই বিবাহ হয়েছিল। স্থানীয় মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডী আসন বানিয়ে তিনি সাধনভজন করতেন, টোল খুলে সংস্কৃত বিদ্যাদান করতেন এবং অবসর সময়ে শ্যামা-সংগীত রচনা করতেন। তিনি একখানি ধর্মতত্ত্ব-সংক্রান্ত কাব্য লেখেন, তার নাম 'সাধক-রঞ্জন', সে-কথা পূর্বেই বলেছি। এটি তন্ত্র-সাধনা-বিষয়ক কাব্য হলেও এতে অনেক স্থলে চমৎকার কবিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জীবন-কথা অধ্যাত্মঘটনার মোড়কে পরিবেশিত হয়ে এখনও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। স্বয়ং কালিকা নাকি বাগ্‌দিনী বেশে তাঁর কাছে এসে মাছ জুগিয়েছিলেন। দস্যুর দল তাঁকে মেরে-ধরে টাকা-কড়ি নিতে এসে তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁর চরণে শরণ নিয়েছিল। রামপ্রসাদের মতোই তাঁর জীবন নানা অলৌকিক গালগল্পে পূর্ণ। মৃত্যুকালে যখন তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার কথা হয়, তখন মুমূর্ষু কবি ঘোরতর প্রতিবাদ করে বলেন যে, গঙ্গা তাঁর জননী দুর্গার সতীন, তাহলে তিনি হলেন কবির সৎ-মা। সৎ-মার তীরে তিনি কেন যাবেন—"কি গরজ? কেন গঙ্গাতীরে যাব? আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ লব?" এখানে মানবরস ও ভক্তিরস এক হয়ে মিশে গেছে। বাস্তবিক তিনি গঙ্গার তীরে যেতে চাননি। তাঁর জীবনের সন-তারিখ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন, শুধু এইটুকু মাত্র জানা যায়।

কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় তিনশো পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি অতি চমৎকার, রামপ্রসাদের চেয়েও কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। মেনকার দুঃখবেদনা কবি অপরূপ কৌশলে ফুটিয়েছেন। মেনকা পাষাণহৃদয় স্বামী হিমালয়ের কাছে অনুযোগ করেন, কেন তিনি কন্যাকে পিত্রালয়ে আনছেন না। অবশেষে গিরিরাজ উমাকে এনে দিলেন মেনকার কাছে :

গিরিরাণী, এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধর হরের জীবনধন।।

মা মেনকা তখন কন্যা উমাকে নিয়ে কত আদর-যত্ন করলেন। কিন্তু নবমীর নিশি অবসান হতে না হতেই হর এসে উমাকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। তখন মেনকা আর কি করবেন, শুধু ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠেন :

ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি,
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো।
বারেক দাঁড়াও মা
এইখানে দাঁড়াও উমা
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো।

বাঙালি মায়ের কন্যাবিরহের বাস্তব বেদনা গানগুলিকে একটা স্বতন্ত্র মানবিক মাধুর্য দান করেছে।

এছাড়াও কালিকার স্বরূপ এবং কবির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা-সংক্রান্ত কয়েকটি গান রামপ্রসাদের থেকে কোনো দিক দিয়েই নিকৃষ্ট নয়, বরং কবিত্ব বিচারে উৎকৃষ্ট। যেমন :

১. সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা,
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও মা করতালি।।
২. তাই শ্যামারূপ ভালোবাসি।
কালী মনোমোহিনী এলোকেশী।।
৩. শুকনো তরু মঞ্জুরে না ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে।
তরু পবনতলে সদাই দোলে প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে।।
৪. মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে।।

এ সমস্ত গানের ভাষা ও বিন্যাসপদ্ধতি অতিশয় মার্জিত ও দৃঢ়সংবদ্ধ। বরং রামপ্রসাদের ভাষা কিছু শিথিল ধরনের। কবির মনোভাবও খুব উদার ছিল। শ্যাম ও শ্যামাকে একীভূত করে তিনি গেয়েছেন :

জান না রে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়।।
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি
দনুজতনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।।

আবেগ, কল্পনা, ভক্তিভাব ও রচনারীতির এরকম সুষ্ঠু সমন্বয় রামপ্রসাদকে ছেড়ে দিলে আর কোনো শাক্তপদকারের রচনার মধ্যে পাওয়া যাবে না। কবি কিছু কিছু বৈষ্ণব পদও লিখেছিলেন, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বিচারে তার দাম বেশি নয়।

উল্লিখিত রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ছাড়াও আরও অনেক পদকর্তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের মধ্যে কিছু কিছু শাক্ত পদ লিখেছিলেন। বিশেষত ভূমিহীন ভূস্বামী ও তাঁদের কর্মচারীদের অনেকেই শ্যামার সেবক ছিলেন এবং বেশ কিছু প্রশংসনীয় শাক্ত পদ লিখেছিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ছিলেন, তাঁর নামে দু'-একটি পদও পাওয়া যায়। তাঁর পুত্রদের মধ্যে কেউ কেউ শাক্ত পদ লিখে খ্যাত হয়েছেন। তাঁর পুত্র শম্ভুচন্দ্রের 'চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি?' কুমার নরচন্দ্রের (নবদ্বীপের রাজকুমার) 'যে ভালো করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নাই' এবং 'মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই' প্রভৃতি গানগুলি এখনও শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয়তা রক্ষা করছে। দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর 'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,' নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'কালীপদ আকাশেতে মনঘুড়িখানা উড়তেছিল,' এবং রামদুলালের 'শ্মশান ভালোবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি' গানগুলির সরল কবিত্ব ও একনিষ্ঠ ভক্তি প্রশংসার যোগ্য। ঊনবিংশ—এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও কেউ কেউ শাক্তগান লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামা-সংগীতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি করতে পারে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, শাক্ত পদ বৈষ্ণব পদের মতো কাব্যগুণে ততটা অলংকৃত না হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর নৈতিক অধঃপতনের দিনে এর ভাব, ভাষা ও ভক্তি শুভ-আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে। এক যুগের হতাশ বাঙালির প্রাণে এই গানগুলি যে দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা দিয়েছিল, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের স্বাদ এনে দিয়েছিল, বিশ্বজননীকে ঘরের মায়ে পরিণত করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বৈষ্ণব পদের মতো এগানে সূক্ষ্ম কলারূপ না থাকতে পারে, কিন্তু আছে আতপ্ত জীবনের স্পর্শ।

২. বাউল গান ও বাউল সাধনা

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর একদল রহস্যবাদী সাধক, যাঁরা বাউল নামে পরিচিত ছিলেন এবং ঐ নামে একটি উপসম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট অধ্যাত্মসংগীত রচনা করেছিলেন তা অষ্টাদশ শতাব্দীর পক্ষে কিছু অভিনব মনে হতে পারে। আধুনিক কালেও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই গানের বিশেষ ভক্ত, কেউ কেউ গ্রাম্য বাউলের আদর্শে গান বেঁধেছেন। হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-৯৬), যিনি 'কাঙাল হরিনাথ' বা 'ফিকিরচাঁদ বাউল' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম বাউল গানের প্রতি আকৃষ্ট হন, নিজেও অনেকগুলি প্রশংসনীয় বাউল গান লিখেছিলেন। তাঁর চরিত্রাদর্শে মুগ্ধ হয়ে তরুণের দলও ঐ বাউলদলে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনের ব্যাপারে কিছুকাল শিলাইদহে অবস্থান করার সময় লালন ফকিরের বাউল গানের সংস্পর্শে আসেন এবং বাউল গানের ভাব-ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজে ঐ গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। নিজের কাব্যরুচি ও সাধনাকেও তিনি কিয়দংশে উক্ত বাউল গান ও বাউল সাধনার অধ্যাত্মমার্গের দ্বারা অনুরঞ্জিত করেন। তাঁর কতকগুলি গান যেন পুরাতন বাউল গানেরই আধুনিক মার্জিত রূপ বলে মনে হয়। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন সাহেবও (ঢাকা) অনেক বাউল গান প্রকাশ করেছেন। ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বাউল গান সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করে এই গান ও তত্ত্বাদর্শ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলজনক তথ্য উদ্ধার করেছেন। কিন্তু আধুনিক কালে এ-দেশে এবং বিদেশে বাউল গানকে জনপ্রিয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

সে-যুগে ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা ও বাহ্যিক ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তিকে বাউল বলত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই অর্থে বাউল শব্দের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থানুসারে দেখা যাচ্ছে স্বয়ং চৈতন্যদেবও নিজেকে বাউল বলেছেন। বাতুল বা ব্যাকুল থেকে 'বাউল' নিষ্পন্ন হতে পারে—অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেমে যারা পাগল। অথবা আউল (আরবি) বা বাউর (হিন্দি—যার মানে বায়ু রোগগ্রস্ত) থেকেও এ শব্দ আসতে পারে। আরবি শব্দটির অর্থ—যাঁরা ঈশ্বরের একান্ত সেবক। যেদিক থেকেই হোক-না-কেন, ঈশ্বরপ্রেমিক, স্বাধীনচিত্ত, জাতিসম্প্রদায়ের চিহ্নহীন একদল ভক্ত বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমে বিশ্বাসী হয়ে বাউল নামে পরিচিত হয়েছিলেন প্রায় চারশো বছর আগে থেকে। সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সহজিয়ারা সমাজে প্রাধান্য অর্জন করলে এঁরা বাউল সম্প্রদায়কে তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত করেন, এঁদের কেউ কেউ বাউল নামেই পরিচিত ছিলেন। মনে হয় বাউলসম্প্রদায় এঁদের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে, এঁদের মধ্য থেকেই উদ্ভিত হয়। অবশ্য যে সমস্ত মুসলমান সুফিসাধক ও ফকিরগণ ইসলামের বাঁধাবাঁধি নিয়ম